হাজার বছরের সাক্ষী ময়নামতির প্রাসাদ

হাসান নীল

কয়েক হাজার বছর আগে মানিকচাঁদ নামের এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সফল ও প্রতাপশালী শাসক। রাজা মানিকচাঁদের স্ত্রী ছিলেন ময়নামতি। গুণে অনন্য ময়নামতির রূপে মুগ্ধ ছিলেন মানিকচাঁদ। ওদিকে ময়নামতি ছিলেন ধর্মপরায়ন। তিনি তার গুরুর কাছে শিষ্যত্ব নিয়ে নিষ্ঠার সাথে সাধনা করছিলেন। তিনি জোতির্বিদ্যা চর্চা ও যোগসাধনা করছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ ময়নামতি বহুদিন এই সাধনায় মগ্ন থেকে জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যান। মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সব দেখার ক্ষমতা অর্জন করেন। একদিন ময়নামতির ইচ্ছা হলো নিজের ভাগ্য গণনা করে দেখার। নিজের ভাগ্য গণনায় বসলেন ময়নামতি। কিন্তু বিপত্তি বাধল সেখানেই।

ময়নামতি যা দেখলেন, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। জানলেন, তিনি এক পুত্র সন্তান জন্ম দেবেন। অসম্ভব শৈর্য-বীর্যের অধিকারী সে সন্তানের আয়ুষ্কাল হবে মাত্র ১৮ বছর। ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো রানি ময়নামতির বুক। সন্তানের ভাগ্যের রাহুর দশা কাটাতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন তিনি। আবার শুরু করেন যোগসাধনা। কঠোর এক তপস্যায় দেবতাদের তুষ্ট করতে সক্ষম হন তিনি। তবে দেবতারা শর্ত দেন তাকে। ১৮ বছর বয়সে পা রাখতেই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করতে হবে পুত্রকে। তবেই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে মিলবে নিস্তার। দেবতাদের দেওয়া শর্ত একবাক্যে মেনে নেন ময়নামতি।

পরে নির্ধারিত সময়ে মানিকচাঁদের ঔরসে এক ফুটফুটে পুত্র জন্ম দেন ময়নামতি। চাঁদের মতো পুত্র পেয়ে রাজার খুশি যেন ধরছিল না। সন্তানের নাম রাখা হয় গোপীচাঁদ। মানিকচাঁদ-ময়নামতির সন্তান গোপীচাঁদ বেড়ে উঠতে থাকেন আদরে-আহ্লাদে। সোনার পালংকে মাথা আর রুপার পালংকে পা এলিয়ে বড় হচ্ছিলেন গোপীচাঁদ। এরইমধ্যে একদিন মহা ধুমধাম করে গোপীচাঁদকে বিয়ে দেওয়া হয় হরিশচন্দ্র রাজার (বর্তমানে সাভার) দুই কন্যা অদুনা আর পদুনার সাথে। দুই স্ত্রী নিয়ে গোপীর সংসার ভালোই কাটছিল। কিন্তু বাধ সাধল ১৮ বছর বয়স। দুশ্চিন্তা পেয়ে বসে ময়নামতিকে। যে করেই হোক সন্তানকে গৃহত্যাগী করাতে হবে। নইলে যে শেষরক্ষা হবে না! একদিন তাই ময়নামতি গোপীকে গৃহ ত্যাগের আদেশ দেন।

এতে অমত ছিল না গোপীর। মায়ের নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। কিন্তু সায় ছিল না তার দুই স্ত্রীর। তারা ময়নামতির এই সিদ্ধান্ত বদলাতে রীতিমতো খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু গোপী ছিলেন মায়ের সিদ্ধান্ত পালনে অনঢ়। তাই স্বামীর বনবাস ঠেকাতে অদুনা-পদুনা ময়নামতির নামে কুৎসা রটান। ময়নামতীকে অসতী আখ্যা দেন গোপীর দুই স্ত্রী। এমতাবস্থায় রাজা মানিকচাঁদ স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করতে তাকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সতী নারী ময়নামতি ফুটন্ত তেল থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন। এতে ভুল ভাঙে রাজার। সেইসঙ্গে অনুতপ্ত হন তার পুত্রবধূরা। এবার মায়ের কথামতো সন্ন্যাস নেন গোপী। করেন গৃহত্যাগ। ময়নামতির পুত্র অনেক বছর পর রাজ্যে ফিরে এলে হাসি ফোটে সবার মুখে। কলরবে মুখরিত হয় রাজ্য। তবে প্রচলিত এ গল্পের কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনই এক গল্পে আজও বেঁচে আছেন রানি ময়নামতি।

হাজার বছরের সাক্ষী

প্রাসাদের প্রত্ন নিদর্শন আজও মাথা উঁচু করে নিজে অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। বহন করছে হাজার বছরের স্মৃতি। দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে ময়নামতির এই প্রাসাদ অন্যতম। কুমিল্লায় অবস্থিত এই স্থাপনা দেখতে রোজই ভিড় জমান কতশত দর্শনার্থী। কেউ আসেন গবেষণার কাজে আবার কেউ আসেন শুধু চোখ মেলে দেখতে। শোনা যায়, রাজা মানিকচাঁদ স্ত্রী ময়নামতির আরাম-আয়েশের জন্যই কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে এই প্রাসাদ গড়েছিলেন। এটি লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের উত্তরে দাঁড়িয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে অবস্থিত। প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে কুমিল্লা সিলেট মহাসড়ক। প্রায় দশ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত এই প্রত্ন নিদর্শন। এই প্রত্ন স্থলটি ময়নামতির অন্যান্য নিদর্শনের চেয়ে একেবারেই আলাদা। এটি সমতল থেকে ১৫.২৪ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। জানা যায়, এখানে প্রথমে একটি ক্রুশকার মন্দির ছিল। পরে এটি সংস্কার করে ছোট আকারের একটি মন্দিরে রূপ দেওয়া হয়। এছাড়া বেশকিছু পোড়ামাটির ফলক ও অলংকৃত ইট আবিষ্কৃত হয় এখানে। রাজা মানিকচাঁদ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তার নাম অনুসারে প্রাসাদের নামকরণ করেন ময়নামতী প্রাসাদ।

ময়নামতী প্রাসাদ খুঁজে পাওয়া

বিখ্যাত এই পুরাকীর্তি সম্পর্কে প্রথম জানা যায় আঠারো শতকে। সেসময় ব্রিটিশ শাসনামল। ১৮৭৫ সালে চলছিল পুরোনো রাস্তা সংস্কারের কাজ। ওই সময় খননকালে শ্রমিকদের হাতুড়ি শাবলের আঘাতে প্রথম জানা যায় ময়নামতি প্রাসাদ সম্পর্কে। আবিষ্কৃত হয় একটি পুরাতন বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ। এই নিদর্শন দেখে ধারণা করা হয়, প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার অব্দের আগে এ এলাকায় বসতি গড়ে উঠেছিল। আর ময়নামতি প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল দশম শতাব্দীতে। এরপর বহুদিন ময়নামতির বাকি সভ্যতা মাটির নিচেই চাপা পড়েছিল। পরে ১৯ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ময়নামতি পাহাড়ে সেনা শিবির স্থাপনকালে আবার পাওয়া যায় এর অস্তিত্ব। এতে টনক নড়ে ব্রিটিশ রাজের।

১৯৫৫ সালে এই পুরাকীর্তির সন্ধানে খনন কাজ চালানো হয়। এতে উঠে আসে শতাধিক বৌদ্ধ-হিন্দু স্থাপনাসহ তৎকালীন বহু প্রত্ন নিদর্শন। উদ্ধার করা এই শতাধিক নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভবদেব বিহার, আনন্দ বিহার, রূপবান মুড়া, কুটিলা মুড়া প্রভৃতি। ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের খনন কাজ একবিংশ শতকে এসেও অব্যাহত রয়েছে। প্রতিনিয়ত এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে একের পর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ২০১৮ সালে এখানে খনন কাজের সময় বেরিয়ে আসে এক বিশেষ পথের সন্ধান। টানা দুই মাসের ওই খনন কাজে কালির দোয়াত, প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার, জীবাশ্ম কাঠসহ বিভিন্ন মূল্যবান প্রত্ন সম্পদের সন্ধান মেলে।

ময়নামতি থেকে কুমিল্লা

ইতিহাসবিদরা গবেষণার জন্য দারস্থ হয়েছিলেন বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থের। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ময়নামতি রাজ্যের পূর্বনাম ছিল দেবপর্বত। দেবপর্বতের পশ্চিমে প্রবাহিত হতো ক্ষীরোদা নামের এক নদী। সেসময় দেবপর্বত ছিল বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে নিয়মিত বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ ও সংস্কৃতি চর্চা হতো। এখান থেকে পাওয়া প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন বলে দেয় এখানে পট্টিকেরা, জয়কর্মান্তবসাক নামের রাজ্য ছিল। সেসময় লালমাই ময়নামতি ছিল বাংলার সমতট রাজ্যের অংশ। এখানে ৩০০ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময় গুপ্ত বংশ, ভদ্র বংশ, চন্দ্র বংশ, রাত বংশ, দেব বংশ, চন্দ্র বংশ, পাল বংশ, বর্মণ বংশের রাজত্ব ছিল। ১৩শ শতকের দিকে এ অঞ্চলে শাসনব্যবস্থার পট পরিবর্তন ঘটে। ময়নামতি চলে যায় মুসলিম শাসকদের হাতে। পরে এ অঞ্চল চলতে থাকে ত্রিপুরার রাজার অধীনে। আর ১৭৬৫ সালে ময়নামতি রাজ্য চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। পরে পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলটির নাম দেওয়া হয় কুমিল্লা।

শাসনামলের বিলুপ্তি

১১ শতক থেকেই ময়নামতির ক্রান্তিকালের সূচনা। সেসময় সমতটের রাজধানী স্থানান্তর করা হয় বিক্রমপুর। এতে করে ময়নামতির গুরুত্ব কমতে থাকে। ১২ ও ১৩শ শতাব্দীজুড়ে ময়নামতির ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চয়তায় ঘেরা। এসময় হিন্দু শাসকদের উত্থান ঘটে। সেই মুসলিম শাসকদেরও বাড়-বাড়ন্ত হতে থাকে। এতে স্থানটি সম্পূর্ণ অনিরাপদ বলে বিবেচিত হতে থাকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। ফলে প্রাণভয়ে ময়নামতির অধিবাসীরা একে একে আবাসস্থল ত্যাগ করতে থাকে। ধীরে ধীরে ময়নামতিবাসীদের আতঙ্ক ও নিরাপত্তার অভাব প্রকট আকার ধারণ করে। এ সময় তারা আরাকান, কামরূপ, তিব্বত, নেপাল, উড়িষ্যাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে ১৩ শতকের মধ্যে ময়নামতি একপ্রকার জনশূন্য হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু অবকাঠামো অর্থাৎ ভবন মন্দিরসহ বিভিন্ন স্থাপনা। ফলে শাসকদের কাছে আরও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে অঞ্চলটি। অনাদরে অবহেলায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আড়ালে পড়ে যায় এ অঞ্চলের স্থাপনাগুলো। পরে একটা সময় মাটি চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য আড়াল হয়ে যায় এ অঞ্চল। এরপর থেকে বন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত ময়নামতি আলোচনারও বাইরে চলে যায়।

কীভাবে যাবেন

ময়নামতি প্রাসাদ দেখতে হলে আপনাকে প্রথমে যেতে হবে কুমিল্লা। বাসে করে যেতে চাইলে উঠে পড়তে হবে সায়দাবাদ থেকে কুমিল্লাগামী বাসে। আর ট্রেনে চেপে যেতে চাইলে ব্যাগপ্যাক কাঁধে চাপিয়ে যেতে হবে কমলাপুর রেল স্টেশনে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র ১০ মিনিটের পথ ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি। পায়ে হেঁটে বা অটোয় করে পৌঁছে যেতে পারবেন সেখানে। ওয়ার সিমেট্রি দেখে এরপর মাত্র তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই দেখবেন আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ময়নামতি রানির সেই বিখ্যাত প্রাসাদ।

ময়নামতি